একক ২৫ ❒ ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন ও বাংলা ভাষা

গঠন

২৫.১ উদ্দেশ্য

২৫.২ প্রস্তাবনা

২৫.৩ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তন ও বাংলা ভাষা

২৫.৪ সংস্কৃত

২৫.৫ বৈদিক ও সংস্কৃত

২৫.৬ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ

২৫.৭ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ

২৫.৮ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিবরণ

২৫.৯ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ

২৫.১০ বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব

২৫.১১ বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব

২৫.১১.১ ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠী

২৫.১২ সারাংশ

২৫.১৩ উত্তরমালা

২৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

২৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কীভাবে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় এসে পৌঁছেছে তার বিবরণ পাবেন।
- বাংলা ভাষার দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব কতটা সে সম্পর্কেও একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হবে।

২৫.২ প্রস্তাবনা

আর্যভাষা-ভাষীরা কখন ভারতবর্ষে এসে অন্যান্য ব্যাপারে প্রতিষ্ঠার সঙ্গো ভাষা ব্যাপারেও কীভাবে আধিপত্য বিস্তার করে এবং নানান বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় এসে পৌঁছয় তার বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গো বাংলা দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক প্রভাবের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও পেতে পারবেন।

২৫.৩ ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন ও বাংলা ভাষা

ঐতিহাসিকদের মতে ভারতে আর্যভাষা-ভাষীদের আগমনকালে আনুমানিক পনের'শ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়। ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে আর্যরা প্রথমে এসেছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে। পরে তারা পৌঁছে যায় পশ্চিম পাঞ্জাবে। এর পরে সমস্ত উত্তর, পূর্ব এবং পূর্বপ্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে—তাদের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়। স্থানীয় ভাষা এবং সংস্কৃতিকেও তারা এই সূত্রে আত্মসাৎ করে নেয়। দক্ষিণ ভারতেও তাদের প্রতিষ্ঠা ঘটে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি জিনিস বিশেষভাবে দেখবার। স্থানীয় কথ্যভাষাগুলি থেকে যায়। এছাড়া পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে আর্যদের আসবার আগে থেকেই একটি জোরালো সংস্কৃতি বর্তমান ছিল। ফলে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণ এখানে কিছুটা বিঘ্নিত এবং বিলম্বিত হয়েছিল।

এইসব ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর মুখের ভাষার মধ্যে কমবেশি পার্থক্য থাকলেও মিল ছিল। সেটিও ভাববার মতো। আর্যদের প্রধান জীবিকা প্রথমে ছিল পশুপালন। যাযাবর হলেও ভারতবর্ষে এসে ধীরে কৃষিজীবী হিসেবেই তারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের ছিল অশ্বশক্তি, ভাষাসম্পদ তথা দেববন্দনামূলক গীতি-সাহিত্য। ঋক্‌বেদের ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপ। এর সংকলনে ধৃত প্রাচীনতম কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী বা তার কাছাকাছি সময়ে। ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন কিছুকাল আগে ক্রীট দ্বীপে পাওয়া হারানো লিপির কিছু অংশ পড়তে পারা গেছে। এর থেকে প্রাচীন গ্রিক ভাষার নিদর্শন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। হিট্টীকে বাদ দিলে এটিই নিঃসংশয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শন। অন্যদিকে ঋক্‌বেদের ভাষাই হল প্রাচীনতম। অবশ্য ভারতবর্ষে আর্যভাষীরা যখন প্রথম প্রবেশ করেছিল তার অনেক পর গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর্যভাষারও নিশ্চয়ই কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আর্যভাষীদের ভারতে প্রবেশের সময় থেকে এই গ্রন্থের সুক্তগুলির রচনা ও সংকলন কালের ব্যবধান যে কত নিশ্চিত করে নির্ণয় না করা গেলেও এটা ঠিক যে তা খুব সামান্য নয়। তবে ঋক্‌বেদে এমন কোনো উক্তি বা সূত্র নেই, যার থেকে বোঝা যায় যে ঋক্‌বেদে রচনা করা সময়ে আর্যভাষীরা তাঁদের আদি বাসভূমির কথা কিছুমাত্র মনে রাখতে পেরেছিলেন। ঐতিহাসিকের নিজের ভাষায় ঃ

'There is no evidence to show that the Vedic Aryans were foreigners or that they migrated into India within traditional memory. Sufficient literary materials are available to indicate with some degree of certainty that the Vedic Aryans regarded Sapta Sindhu as their original home.' (The History & Culture of the Indian People)—Dr. R.C. Majumder

২৫.৪ সংস্কৃত

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার (Old Indo-Aryan) সাহিত্যিক রূপ ছিল দু'রকম। এর মধ্যে যেটি সবচেয়ে পুরোনো সেটি হল ঋক্‌বেদ এবং পরবর্তীকালে বৈদিক সাহিত্যের ভাষা, অন্যটি অর্বাচীন কালের। সে সময়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের ব্যবহারের ভাষা এটি। এছাড়া লৌকিক নানা গল্প-উপাখ্যানের ভাষা হিসেবেও এর ব্যবহার ছিল। এ ভাষার লিখিত কোনো নমুনা পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তীকালের কাব্য পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে এর স্মৃতি রয়ে গিয়েছে। পাণিনির হাতে এ ভাষাই 'সংস্কৃত' হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃতকে বোঝালেও ঐ সময়ের ভাষাকে অনেকগুলি সূক্ষ্মপর্যায়ে ভাগ করা চলে।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী বা তার কিছু পরে পাণিনি বর্তমান ছিল। তাঁর গ্রন্থে, তিনি আপিশলি, কাশকৃৎস্ন, শাকল্য প্রভৃতি চৌষট্টিজন পূর্বসূরির নাম করেছেন। তাঁর আলোচনা পদ্ধতি থেকে বোঝা যায় যে অনেক পারিভাষিক শব্দই পূর্ব থেকে চলিত ছিল।

আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত বলে পাণিনির গ্রন্থের নাম অষ্টাধ্যায়ী। এর সূত্র সংখ্যা সাড়ে চার হাজার। পূর্বসূরিদের কোনো কোনো পরিভাষা বা সূত্র তিনি গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁর মৌলিকতার পরিচয় নিহিত রয়েছে চোদ্দটি মূল সূত্রের ওপর। পাণিনির বিবেচনায় প্রত্যেকটি শব্দের মূলে রয়েছে কোনো না কোনো ক্রিয়া বোঝায় এমন এক অক্ষর বিশিষ্ট ধাতুপ্রকৃতি—এর সঙ্গে উপসর্গ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সমস্ত শব্দের সৃষ্টি। ভাষার মূলে রয়েছে বাক্য। প্রাচীন বৈয়াকরণের শব্দের চাররকম পার্থক্য কল্পনা করেছেন। পাণিনি স্বীকার করেছিলেন তিনটি পার্থক্যের—১. বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম (সুবন্ত) ২. ক্রিয়া (তিঙন্ত) এবং ৩. অব্যয় (নিপাত)। ধ্বনির উৎপত্তিস্থান এবং উচ্চারণের ঝোঁক বা য- অনুসারে পাণিনি যেভাবে বর্ণের বর্গীকরণ বা শ্রেণিবিন্যাস করেছেন আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের বিচারে তা আজও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃতের তুলনামূলক পাঠও তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

পাণিনির সময়ে ভদ্র বা শিক্ষিতজনের প্রধান ভাষা ছিল উদীচী বা উত্তর-পশ্চিমা। তিনি নিজেও ছিলেন এই অঞ্চলেরই মানুষ। তাঁর ব্যাকরণেও প্রাধান্য পেয়েছে এই ভাষা। কিন্তু অন্য অঞ্চলের ভাষা তিনি একেবারেই উপেক্ষা করেননি।

সাধারণ মানুষ অবশ্য এই ব্যাকরণের ওপর একেবারেই নির্ভর করেনি। পাণিনির বিবেচনায় যা অসিদ্ধ সেই শিষ্ট ভদ্রভাষায় তারা পুরাণ, কাব্য বা ধর্মতত্ত্বের আলোচনা শুনত বা পড়ত। পুরাণের ভাষার মধ্যে এই

অ-সংস্কৃত ভাষার চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা যখন মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে পৌঁছেছে তখনও কোনো কোনো সম্প্রদায় বিশেষ করে উত্তরাপথের বৌদ্ধরা এই লৌকিক প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেই তাঁদের শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই ভাষাই সেই 'বৌদ্ধ সংস্কৃত'।

২৫.৫ বৈদিক ও সংস্কৃত

বৈদিক ও সংস্কৃতে ধ্বনির দিক দিয়ে পার্থক্য তেমন নেই। কিন্তু ব্যাকরণের পার্থক্য আছে। বৈদিক স্বর (Pitch Accent) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। বৈদিক শব্দরূপ এবং ধাতুরূপের বিপুল বৈচিত্র্য। শব্দরূপে কতগুলি অতিরিক্ত পদ আছে। এ ছাড়া এ দু'য়ের শব্দরূপে তেমন পার্থক্য কিছু নেই। তবে ধাতুরূপের বাহুল্য বা বৈচিত্র্য বৈদিকে খুবই বেশি। সংস্কৃতে 'ভাব' (Mood)-এর সংখ্যা কম। নির্বন্ধ ভাবের প্রয়োগ শুধু 'মা' এই অব্যয়ের মধ্যেই সীমিত। বৈদিকে বর্তমান, সামান্য অতীত, সম্পন্ন অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই চাররকম কালের বিভিন্ন ভাবের রূপ হতে পারত। সংস্কৃতে কেবল বর্তমান কাল এবং কোনো কোনো সময় সামান্য অতীত কালেরই ভাষান্তর ঘটে থাকে। সংস্কৃতে পাণিনির সময়ে বা তার পরে ক্রিয়ার কাল বলতে ইংরেজি Tense শব্দের দ্যোতনা বোঝাত না। এখন যাকে Tense বলি তা সংস্কৃতে বোঝাত ক্রিয়ার প্রকৃতিকে। পাণিনির কাছে 'বর্তমান' শব্দের অর্থ ছিল যে ক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। 'অতীত' বলে কোনো কিছু তিনি বিবেচনা করেননি। অতীত বলতে তিনি বুঝেছেন যা শেষ হয়েছে, যা এখন হচ্ছে না, যা অগোচরে ঘটেছে কিন্তু যার ফলে এখন অবগতির মধ্যে, এমন ক্রিয়া।

বৈদিকে যে সব ক্রিয়াজাত বিশেষণের প্রাধান্য ছিল তা মোটামুটি এই রকম ঃ

১. শতৃ-শানচ্ (শতৃ ঃ গম্—গচ্ছৎ, ধীর—ধাবৎ, দশ—পশ্যৎ ; শানচ ঃ সেব্—সেবমান, শী—শয়ান)
২. ক্বসু—কানচ্ (ক্বসু ঃ গম্—জগ্মিবেস্, দৃশ—দদৃশিবস্ ; কানচ্ ঃ সেব্-সিষেবান, রাজ্—রবাজান্)
৩. স্যতৃ—স্যামান্ (স্যতৃ ঃ ভূ—ভবিষ্যৎ, কৃ—করিষ্যৎ ; স্যমান্ ঃ সেব্-সেবিষ্যমাণ্, বৃৎ—বর্ত্তিষ্যমাণ) প্রভৃতি।

এর সঙ্গো ছিল ক্ত্বাচ্-ল্যপ্, তুম্-তবৈ প্রভৃতি অসমাপিকা পদের প্রাচুর্য। সংস্কৃতে এ সব অনেক কমে গিয়েছে। প্র, পরা, অপ, নি-র মতো উপসর্গ বৈদিকে সাধারণ ক্রিয়া-বিশেষণ হিসেবে এবং পৃথক পদ হিসেবেও ব্যবহৃত হত। সংস্কৃতে এগুলির প্রয়োগ ক্রিয়াপদের আগে। কেবল আ, প্রতি, পরি, অনু প্রভৃতি উপসর্গ কোনো কারকের অর্থে এবং কোনো কারকের সঙ্গো ব্যবহৃত হলে (কর্ম-প্রবচনীয়) পৃথকভাবে যুক্ত হত। সমাসের ব্যবহারও সংস্কৃতে বৈদিকের চেয়ে বেশি। বৈদিকে দুটির বেশি পদের সমাস ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে সংস্কৃত একটি সমাসবহুল ভাষা। এছাড়া অতীতকালে সমপিকা ক্রিয়ার অর্থে 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের ব্যবহার সংস্কৃতে নতুন। সবচেয়ে বড় কথা হল বৈদিকে ছিল না এমন বহু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নেওয়া হয়েছে। বৈদিকের শব্দভাণ্ডারের একটা বিরাট অংশ সংস্কৃতে গৃহীত হয়নি।

২৫.৬ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ

এক। মূল বৈদিক আর্যভাষা থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃতে স্বরের সংখ্যা কমে গিয়েছে। এছাড়া রয়েছে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ঋ, ঌ, এ, ঐ সহ স্বরবর্ণ এবং শ, ষ, স সমেত ব্যঞ্জনবর্ণগুলির ঠিকঠাক ব্যবহার। সেই সঙ্গে স্বরবর্ণের গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রাসরণ তথা অপশ্রুতি ছিল সংস্কৃতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দুই। বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জনের পর্যাপ্ত ব্যবহার।

তিন। শব্দরূপে বৈচিত্র্য বিপুল। তিন পুরুষ, দুই পদ (আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ)। বাচ্য বলতে কর্তা, কর্ম এবং ভাববাচ্য।

চার। উপসর্গ ধাতু বা শব্দের প্রথমে যুক্ত হলেও তাদের স্বাধীন ব্যবহারও যথেষ্ট ছিল না।

পাঁচ। সমাসের প্রয়োগ ছিল বৈচিত্র্যসম্পন্ন এবং বিপুল পরিমাণেই।

ছয়। বাক্যে পদবিন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট বিধির প্রয়োজন ছিল না।

সাত। ধাতুর সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় এবং শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত-প্রত্যয় যুক্ত করে ইচ্ছেমতো শব্দ তৈরি করা যেত।

আট। ছন্দপদ্ধতি ছিল অক্ষরমূলক।

২৫.৭ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার (Middle Indo-Aryan) সাধারণ লক্ষণ

বৈদিক ভাষা উচ্চারণ এবং ব্যাকরণের দিক দিয়ে সরলতার হয়ে সংস্কৃতের রূপ নিল। তবে পুরনো কাঠামোর পরিবর্তন কিছু হয়নি। পরে, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ভারতীয় আর্যভাষার যে পরিবর্তন ঘটতে লাগল তাতে এই পুরনো কাঠামোটির অনেক কিছুই বদলে গেল। এ ভাষা রূপ নিল প্রাকৃতের। 'প্রাকৃত' কথাটির তাৎপর্য হ'ল—যা 'প্রকৃতি' বা জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষা। 'সংস্কৃত' ভদ্রসমাজের ভাষা। এরই বিপরীতে 'প্রাকৃত' নামটির অবস্থান।

এই প্রাকৃত বা মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তিনটি স্তর বা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এসে পরিণতি লাভ করেছে। এই স্তর তিনটি হ'ল যথাক্রমে প্রাচীন, মধ্য এবং অন্ত্যস্তর। প্রাচীন পর্বের কালসীমা ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দ। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দ হ'ল মধ্য পর্বের সময়। অন্ত্যস্তর খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এতটা বাঁধাবাঁধি অবশ্য ঠিক নয়। কিন্তু আলোচনার কাঠামোগত স্বার্থে এটি মোটামুটি মেনে নিতে হয়। প্রথম পর্বের প্রাকৃতের নিদর্শন রয়েছে অশোকের অনুশাসন, খ্রিস্টপূর্ব সময়ের অন্যান্য প্র-লিপি এবং হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের পালি শাস্ত্রগ্রন্থের প্রাচীনতম পুথিতে। দ্বিতীয় পর্বের নিদর্শন রয়েছে খ্রিস্ট-পরবর্তী প্রথম তিন শতাব্দীর প্র-লিপিতে, মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী-অর্ধমাগধী-পৈশাচী ইত্যাদি সাহিত্যিক প্রাকৃতে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতে। অন্ত্যস্তরের দৃষ্টান্ত রয়েছে অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠে।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণগুলি (MIA) এইরকম ঃ

সংস্কৃত ভাষা যখন প্রাকৃতের রূপ নিয়েছে তখন তিনটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট। এই তিনটি ক্ষেত্র হ'ল—ধ্বনি, শব্দ ও ধাতুরূপ এবং ধাতু ব্যবহার।

ধ্বনিগত পরিবর্তন আলোচনা করলে দেখা যাবে 'ঋ'-কারের উচ্চারণ লুপ্ত হয়েছে। এর বদলে এসেছে 'অ'-কার, 'ই'-কার, 'উ'-কার—কখনও কখনও 'এ'-কারের ব্যবহার। কোনো কোনো সময় এগুলি এসেছে 'র'-এর সঙ্গে যুক্ত আকারে অর্থাৎ, 'র', 'রু'-রূপে। এই পরিবর্তন মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মাঝামাঝি সময়ে স্পষ্ট হয়েছে, তার আগে নয়।

যেমন 'মৃগ' শব্দটি। মধ্যভারতীয় আর্যের প্রথম পর্বে (Early Middle Indo-Aryan) এটি রূপান্তরিত হয়েছে 'মগ', 'মিগ', 'মুগ', 'ম্রুগ' বা 'ম্রিয়'-তে—মাঝামাঝি সময়ে সেটি হয়েছে 'মঅ', 'মিঅ'। 'বৃদ্ধ' হয়েছে বুড্‌ঢ।

একইরকম ভাবে ঐ-কার, ঔ-কারের জায়গায় এসেছে এ-কার, ও-কারের ব্যবহার। 'ঔষধানি' হয়েছে 'ওসধানি'।

দু'অক্ষর বিশিষ্ট 'অয়' বা 'অব'-এর জায়গা সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে—'এ', 'ও'। ফলত 'ভবতি' হয়েছে 'ভোতি' বা 'হোতি'।

একেবারে প্রথমে 'পূজয়তি' ছিল 'পূজোতি', মাঝামাঝি সময়ে হয়েছে 'পূজোদি', 'পূজেই'—শেষ পর্যায়ে 'পূজই'। ভারতীয় আর্যভাষার কোনো কোনো উপভাষায় অবশ্য এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ হতে কিছু সময় লেগেছে। যেখানে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, আছে পদের শেষে অনুস্বার সেখানে সংস্কৃতের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়েছে। 'কান্তাং' হয়েছে 'কন্তং' ?

পদের শেষে অ-কারের পর বিসর্গ থাকলে দু'য়ে মিলে তা 'ও'-কার বা 'এ'-কার হয়েছে। কখনও কখনও লুপ্ত হয়েছে। যেমন 'জন'ঃ হয়েছে 'জনো'—'জনে', 'জন'।

ঋ, র, শ বা ষ—ধ্বনির যে কোনো একটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কখনও বা আপনা থেকে দন্ত্য ব্যঞ্জন ধ্বনি 'মূর্ধন্য' ধ্বনি হয়ে গেছে। এই সূত্রে 'কৃত' হয়েছে প্রথম পর্যায়ে 'কত', বা 'কট' ; মধ্য পর্যায়ে 'কদ', 'কঅ' বা 'কট'।

পদের প্রথমে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে তার একটা লুপ্ত হয়ে গেল বা স্বরভক্তি ঘটল। যেমন—'ত্রী' বা 'ত্রীণ' হয়েছে 'তী' বা 'তিন্নি'। উত্তর-পশ্চিম উপভাষা বা পৈশাচী প্রাকৃত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপভাষা বা মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী প্রাকৃতে শব্দের প্রথমে এই যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার অবশ্য কিছুকাল থেকে গিয়েছিল। তাই সেখানে 'প্রিয়স্য'-পরিবর্তিত রূপেও তার আদি ব্যঞ্জনধ্বনি অবিকৃত রেখেই হয় 'প্রিয়স্‌স'।

পদের মধ্যের যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যাপারেও এক ধরনের প্রবণতা দেখার মতো। সেখানে সমীভবন অথবা স্বরভক্তিই দেখা দিচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ 'সর্বত্র' হয়েছে 'সব্বত্ত', 'চিকিৎসা' হয়েছে 'চিকিৎসা'। পদের প্রথমে অথবা মাঝখানে অবস্থিত 'ক্ষ' বা 'চ্ছ' হয়েছে যথাক্রমে 'ছ', 'ক্‌খ' অথবা 'খ'। ফলে 'ক্ষণতি' হয়েছে 'ছনতি'। য-ফলা থাকলে পৈশাচী প্রাকৃত বা উত্তর-পশ্চিমা উপভাষা এবং মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী বা দক্ষিণ-পশ্চিমা

উপভাষায় সমীভবন হয়েছে। 'কর্তব্য' হয়ে গিয়েছে 'কট্টব্ব'। প্রাচ্যমধ্যা এবং প্রাচ্যায় এক্ষেত্রে সম্প্রসারণ হয়েছে। 'কর্তব্য' হয়েছে 'কট্টবিয়'।

শব্দরূপে দেখা যায় পদের শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জন লুপ্ত হবার ফলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ পরিণত হয়েছে স্বরান্ত-শব্দে। অধিকাংশ ব্যঞ্জনান্ত শব্দের রূপ-অকারের মতো হত। যেমন 'কর্মণে' একেবারে প্রথম পর্বে হয়েছে 'কম্মায়'। যে সব শব্দের শেষে আ, ই বা উ ছিল তাদের রূপের কিন্তু বদল ঘটেনি।

প্রাকৃতের ধাতুরূপে কোনো বৈচিত্র্য নেই। কোনো কোনো সময় একটি মূল ধাতু থেকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ধাতুর। এই সূত্র ধরেই 'বাদ্যতে' থেকে এসেছে 'বাজুই', বাদয়তি' থেকে এসেছে 'বাত্রই'।

সংস্কৃতে শুধু এক অক্ষর বিশিষ্ট আ-কারান্ত ধাতুর নিজস্ব রূপে 'পয়' **বিকরণ** (বিকরণ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Stem-affix, ধাতুর মধ্যে বা ধাতুর ও বিভক্তির মাঝখানে যা নিহিত হয় তাকে বিকরণ বলে) যুক্ত হত। যেমন 'দাপয়তি' বা 'মাপয়তি'। প্রাকৃতে বা মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সব ধাতুর নিজন্তেই এই বিবরণ লক্ষণীয়। সংস্কৃতে ক্রিয়াপদের কাল ছিল ছ'টি, মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় তা তিনটিতে এসে দাঁড়াল।

বিবর্তনের ধারায় দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। চতুর্থী ও পঞ্চমীর একবচনেরও সেই লোপ হবার অবস্থা। বিভক্তির প্রসঙ্গো বলা যায় দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা চতুর্থীর এবং তৃতীয় ও সপ্তমীর সাহায্যে পঞ্চমীর অর্থ বোঝান হত।

২৫.৮ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিবরণ

এক। **কাশ্মীরী**—বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের অনেকেই কাশ্মীরীকে দরদীয় অথবা ইরানীয় প্রভাবিত ভাষা বলে বিবেচনা করেছিলেন। সেই সূত্রেই, অনুমান করা যেতে পারে যে এটি পৈশাচী প্রাকৃত থেকে জাত। কাশ্মীরীতে সাহিত্যসৃষ্টিও অত্যন্ত প্রাচীন। সবচেয়ে পুরানো দৃষ্টান্ত হিসেবে চতুর্দশ শতাব্দীর শৈবতন্ত্রাচার্য লল্লের কয়েকটি কবিতার কথা বলা যায়। **কোহিস্তানী, শীনা, চিত্রালি** এই গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রধান ভাষা। আগে ব্রাহ্মী থেকে সৃষ্ট শারদালিপিতে কাশ্মীরীভাষা লেখা হত, এখন হয় **ফারসি** অক্ষরে।

দুই। **পাঞ্জাবী**—এর প্রধান শাখা দু'টি। **পশ্চিমা পাঞ্জাবী বা লহন্দী** এবং পূর্ব পাঞ্জাবী বা **হিন্দকী।** অনেক ভাষাবিদেরই ধারণা যে দু'টি শাখাই **কেকয়** অপভ্রংশজাত। পশ্চিমা শাখায় রয়েছে দরদি ভাষার প্রভাব। দুটোতেই প্রাচীনের অনুসরণের চেষ্টা আছে। যেমন প্রাকৃতের যুক্তব্যঞ্জন চলিত আছে, একক ব্যঞ্জনের ব্যবহার হচ্ছে যুগ্ম ব্যঞ্জনের মতো—'উপর'—'উপ্‌পর'। লণ্ডা অথবা ফারসি লিপিতে পশ্চিমা পাঞ্জাবী লেখা হয়। শিখদের 'জনম সাখি' বা 'গ্রামগীতি' ছাড়া অন্য তেমন কিছু সাহিত্য এ ভাষায় লেখা হয়নি। 'গুরুমুখী' লিপিতে লেখা হয় পূর্বী পাঞ্জাবী। এটা লন্ডারই দেবনাগরী প্রভাবিত অন্য একটি রূপ। গুরু অঙ্গাদ সিং এর প্রবর্তক। এ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশি। শিখদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'আদিগ্রন্থ', 'গ্রন্থসাহেব' পূর্বী পাঞ্জাবী বা হিন্দকীর সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন। পশ্চিমা হিন্দীরও কিছু প্রভাব এতে আছে।

তিন। **সিন্ধী**—সিন্ধী হ'ল কচ্ছ ও সিন্ধু অঞ্চলের ভাষা। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে পুরনো বলে ভাষাবিদদের ধারণা। আরবি-ফারসির বাহুল্যও বিশেষ করে দেখবার। কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের মতে 'ব্রাচড়' অপভ্রংশ থেকে এ ভাষার উদ্ভব। ঘ, ঝ, ধ, ভ-এর মতো সঘোষ মহাপ্রাণধ্বনিগুলির অনেকটা বাঙ্গালী উপভাষার ধাঁচে ন, জ, ড, দ, ব হওয়া এর এক বিশিষ্ট লক্ষণ। একক ব্যঞ্জনে পরিণত যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর এতে দীর্ঘ হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই এর সাহিত্য নির্দশন পাওয়া গেছে। পাঞ্জবীর সঙ্গে এ ভাষার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

চার। **রাজধানী**—রাজস্থান বা রাজপুতানায় প্রচলিত ভাষাই রাজস্থানী ভাষা হিসেবে পরিচিত। মারোয়াড়ী, জয়পুরী, মেবারী, মালবী ইত্যাদি এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। অনুমান করা যায় নাগর অপভ্রংশ থেকেই এর উদ্ভব। এর মধ্যে প্রধান হ'ল পশ্চিমা রাজস্থানী বা মারোয়াড়ী। নাগর অপভ্রংশেরই পশ্চিমা রূপ গুজরাটী। মারোয়াড়ীতে লেখা প্রাচীন গাথা পাওয়া গিয়েছে। নাগরী এবং মহাজনী দু'রক লিপিই এখানে চলিত।

গুজরাটীতে লেখা সাহিত্যরচনার উদাহরণ চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই পাওয়া গেছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে গুজরাটী পশ্চিমা রাজস্থানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক ভাষায় পরিণত হয়। এ ভাষার সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন রয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ 'মুগ্ধাববোধ ঔক্তিক' থেকে।

পাঁচ। **মারাঠী**—সম্ভবত মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ থেকে এর জন্ম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে লেখা জ্ঞানদেবের গীতার টীকাভাষ্য 'জ্ঞানেশ্বরী' এই ভাষার সবচেয়ে পুরনো বই। কিছু কিছু প্রাচীনত্ব এতে রয়ে গিয়েছে। যেমন এর পদের শেষে ই-কার বা উ-কার প্রায় সময়েই লুপ্ত হয়নি। ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগও আছে। এর দু'টি উপভাষা। কোঙ্কনী এব বরারী। মারাঠীতে নাগরী লিপি ব্যবহৃত হয়। অনেকে কোঙ্কনীকে মারাঠীর উপভাষা না বলে একটি পৃথক ভাষার মর্যাদা দিতে চান।

ছয়। **পশ্চিমী হিন্দী**—পরিভাষায় পশ্চিমা হিন্দী বলে চিহ্নিত হলেও সাধারণভাবে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী হিসেবেই এর পরিচয়। এ ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশেরই উত্তরাধিকার। এর প্রধান শাখা দু'টি। একটি মথুরা অঞ্চলের ভাষা—'ব্রজভাষা'। সাহিত্য গৌরবে প্রকৃতই সমৃদ্ধ। অন্যটি—'খড়ীবোলী'। এইটিই প্রকৃত হিন্দী ভাষা। পশ্চিমা হিন্দীর পুরনো রচনার সবটাই ব্রজভাষায়। দক্ষিণভারতে পশ্চিমা হিন্দী মুসলমান কবিদের হাতে বিশেষভাবে অনুশীলিত হয়েছিল। সেই সাহিত্যের ভাষা হ'ল 'দেখ্নী'। এর থেকেই 'উর্দু-র সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে দিল্লীতে এর সূচনা। স্বাভাবিকভাবেই এতে আরবি, ফারসি শব্দের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি এবং লেখাও হয় ফারসি লিপিতে। নাগরী লিপির বিপরীতে যা এক উজ্জ্বল অস্তিত্ব। পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষাগুলির মধ্যে বঙ্গারু বা হরিয়ানী, কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, কনৌজী এবং বুন্দেলী উল্লেখযোগ্য।

সাত। **পূর্ব হিন্দী**—ভাষাতত্ত্বগত বিচারে পশ্চিমা হিন্দীর সঙ্গে এর গুরুতর পার্থক্য আছে। এই ভাষাগুচ্ছকে বলে 'কোশলী'। এর মধ্যে তিনটি আছে—অবধী, বাঘলী ও ছত্তিগেড়ী। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে অবধী।

এর প্রাচীন সাহিত্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন। উল্লেখ্য সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আছে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা দাউদ-এর 'চান্দয়ন',—ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধি মুহূর্তে রচিত কুতুবন-এর 'মৃগাবতী', ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মালিক মহম্মদ জায়সী-র 'পদুমাবতী' এবং ঐ শতাব্দীরই শেষ দিকে রচিত তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'। 'অর্দ্ধমাগধী' অপভ্রংশ থেকেই পূর্বী হিন্দীর উদ্ভব।

আট। **মগধী**—ভোজপুরী, মৈথিলী, মগজী, ওড়িয়া, বাংলা এবং অসমীয়া এই ছটি ভাষা আলোচ্য ভাষাগুচ্ছের অন্তর্গত। এর মধ্যে প্রথম তিনটি হ'ল পূর্বী এবং শেষ তিনটি পশ্চিম মগধী। এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল অতীতকালে 'ল' বিভক্তি, 'ব' প্রত্যয় দিয়ে ভবিষ্যৎকালের গঠন। এ ছাড়াও রয়েছে অতীতকালে প্রথম পুরুষে সকর্মক-অকর্মক ক্রিয়ার রূপগত পার্থক্য।

'ভোজপুরী' বলা হয় কাশীতে। এ ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি বলতে কবীরের গান। 'মগহী'-তে সাহিত্যসৃষ্টি নেই বললেই চলে। অবশ্য 'মৈথিলী' সমৃদ্ধ। উমাপতি ওঝার 'পারিজাত-হরণ' এ ভাষার সবচেয়ে পুরনো সৃষ্টি। রচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। জ্যোতিরিশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণর-াকর' উল্লেখ করার মতো গদ্যরচনা। বিদ্যাপতি তো আছেনই।

'ওড়িয়া' এবং **'অসমীয়া'**-র সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অতি নিকট। প্রাথমিক পর্বে একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে থেকে ওড়িয়ার নিজস্বতা প্রথম রূপ নেবার চেষ্টা করে। দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনেই পুরনো ওড়িয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। ষোড়শ-শতাব্দীতে চৈনত্যদেবের সান্নিধ্যে এর সমৃদ্ধি ঘটে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই জগন্নাথ দাস ভাগবত রচনা সম্পূর্ণ করেন। ধ্বনি পরিবর্তন ওড়িয়ায় তেমন কিছু হয়নি। মারাঠী এবং দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব এর ওপর আছে।

'অসমীয়া' বাংলা থেকে আলাদা হয়ে যেতে শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীর পরে। আমাদের কাছে 'কামরূপী' উপভাষা হিসেবে যার পরিচয় তার সঙ্গে অসমীয়ার পার্থক্য তেমন কিছু নয়। আধুনিক কালে অবশ্য অসমীয়া কামরূপী থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকেই এর সাহিত্য-সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেছে। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে এই ভাষাতেই প্রথম নাটক এবং গদ্য-সাহিত্য রচিত হয়েছে।

নয়। **সিংহলী**—সিংহল বর্তমানে ভারত ভূখণ্ডের বাইরে একটি পৃথক রাষ্ট্র হলেও সিংহলী ভাষার ভারতীয় আর্যভাষারই উত্তরাধিকার। 'প্রাচ্যা প্রাকৃত' থেকেই এর সৃষ্টি। সিংহলের সবচেয়ে পুরনো ভাষা হ'ল 'এলু'। সেখানকার অবহট্‌টের মতো। মহাপ্রাণবর্ণ এখানে অল্পপ্রাণ হয়েছে, তিনটি শিসধ্বনির বদলে আছে কেবল 'খ'-এর অস্তিত্ব। এর ওপর এখন তামিলের প্রভাব আছে। এতে সাহিত্য রচনার নিদর্শন পাওয়া গেছে অষ্টম শতাব্দী থেকে। এ ভাষারই একটি শাখা হ'ল মালদ্বীপে প্রচলিত 'মালী' ভাষা।

দশ। **জিপ্‌সী (Gypsy) বা যাযাবরী**—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে জিপসী বা যাযাবরী ভাষা চলিত আছে ভাষাতাত্ত্বিকদের বিবেচনায় তা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষারই অন্তর্গত। এই ভাষাগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষেরা

তৃতীয় থেকে পঞ্চম খ্রিস্টব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ থেকে দলবদ্ধভাবে বার হয়েছিল। এই জায়গার ভাষার সঙ্গো জিপ্‌সীর মিল তাই এত বেশি। এশিয়া, ইয়োরোপের অনেক ভাষার শব্দ এতে স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা যে দেশে বাস করে সেখানকার ভাষার সঙ্গোই ভারতীয় ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। বাংলার সঙ্গো জিপ্‌সীর মিল আছে। যেমন 'মই'—অর্থ, 'আমি' ; 'সাপনী'—অর্থ, 'সাপিনী' ; 'তুমে দুই'—অর্থ, 'তোমরা দুজন' ; 'দুই দিবেসা গিলে'—অর্থ, 'দুই দিবস গেলে' ইত্যাদি। ইংরেজি মেশানো জিপ্‌সী ভাষার উদাহরণ হ'ল—'The tatcho drome to be a jinni mengro is to shun, dik and rig in zi—'The tatcho' (তচ্চো = সত্য-সাচ্চা) 'drome' (পথ) to be a jinni mengro (জ্ঞানী মানুষ) is to shun (শোনা), dik (দেখা) and rig (রাখা) in zi (ধী = মন)।

পুরোপুরি ভাবে টানা অর্থ হ'ল ঃ জ্ঞানী হওয়ার সত্য পথ—শোনা, দেখা এবং মনে রাখা। ইয়োরোপের লোক কখনও এদের বলে বোহেমিও, কখনও 'ইজিপসীয়'—'ই' লুপ্ত হয়ে 'জিপ্সী'। নিজেদের এরা 'রোমানি' বলে পরিচয় দেয়।

২৫.৯ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ

এক। **ব্যঞ্জনধ্বনির সরলতা**—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার (OIA) যে যুবব্যঞ্জনগুলির মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় প্রধানত সমীভবনের ফলে যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল এখানে তা দাঁড়িয়েছে একটিমাত্র ব্যঞ্জনে। আগের হ্রস্বস্বর হয়েছে দীর্ঘ। ফলত প্রাচীন ভারতীয় আর্যের 'পক্ব' প্রাকৃতে হয়েছে 'পক্‌ক'—বাংলা বা হিন্দীতে তার রূপান্তর হয়েছে 'পাক'-এ। এইরকম আর একটি দৃষ্টান্ত 'মধ্য'—'মগঝ'—'মাঝ'।

দুই। **সংস্কৃত ধ্বনি ঃ** প্রতিষ্ঠা হয়েছে অ-কারের সংস্কৃত উচ্চারণ রীতির। পরে যুগ্ম ব্যঞ্জন হয়েছে সরল এবং আগের হ্রস্ব অ-কার রূপান্তরিত হয়েছে দীর্ঘ অ-কারে। যেমন সর্ব—সব্ব—সব ; অষ্ট—অট্‌ট—অঠ প্রভৃতি। ব্যতিক্রমও আছে। কেননা উত্তর-পশ্চিমা উপভাষার ধ্বনিতে পরিবর্তন এভাবে আসেনি। পুরনো রীতি অনুসারে সেখানে কোনো কোনো সময় যুগ্ম ব্যঞ্জন থেকে গিয়েছে। 'অদ্য' হয়েছে 'অজ্জ'।

তিন। **অনুনাসিক ধ্বনির ক্রমাবলুপ্তি ঃ** নব্য ভারতীয় আযভাষার যুগ্ম ব্যঞ্জনের ঠিক আগেকার নাসিক্য ধ্বনিগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসে শেষে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিগুলিকেও অনুনাসিক করে দিয়েছে। পরে এই অনুনাসিক ধ্বনিগুলিই লুপ্ত হয়েছে। 'দন্ত'-এর প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর হয়েছিল 'দান্‌ত' হিসেবে। আধুনিক বাংলায় এরই রূপান্তরিত আকার 'দাঁত'। 'কম্প' হয়েছে 'কাঁপ' ; 'দণ্ড' হয়েছে 'দাঁড়'। এইরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত।

চার। **ই, ঈ, বা উ, ঊ, জনিত পরিবর্তন ঃ** পদের ভেতরকার ই বা ঈ-র সঙ্গো অ বা আ এবং উ ঊ-এর সঙ্গো অ বা আ যথাক্রমে ই, ঈ, উ, ঊ হয়েছে। এই ধারাতেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার 'ঘৃত' প্রাকৃতে হয়েছে 'ঘিঅ'। বাংলায় এর থেকে এসেছে 'ঘী'। অনুরূপভাবে 'মৃত্তিকা' হয়েছে 'মাটি' বা 'মাটী'।

পাঁচ। **লিঙ্গা সংক্রান্ত পরিবর্তন ঃ** পদের শেষের স্বরধ্বনি বিকৃত অথবা লুপ্ত হয়েছে। এর ফলে আগেকার লিঙ্গা সংক্রান্ত পার্থক্য প্রায়ই থাকেনি। ক্লীবলিঙ্গা রয়ে গেছে কেবল গুজরাটি আর মারাঠি-তে। অন্য

ভাষাগুলিতে পুংলিঙ্গা-স্ত্রীলিঙ্গাভেদ আছে। কিন্তু সেই ভেদ আর প্রাচীন লিঙ্গা প্রকরণ এক নয়। একই পুংলিঙ্গা-স্ত্রীলিঙ্গা শব্দ কোথাও হয়েছে, পুংলিঙ্গা, কোথাও বা স্ত্রীলিঙ্গা। যে সব শব্দ অ-কারান্ত, তার শেষ লিঙ্গা পরিবর্তন খুবই কম হয়েছে।

ছয়। **প্রাচীন শব্দরূপ, কারক, অনুসর্গ প্রভৃতির নতুনতর বিন্যাস ঃ** প্রাচীন বা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম দিককার শব্দরূপের চিহ্ন অপভ্রংশ যেটুকু বিদ্যমান ছিল, পদান্তরে স্বরধ্বনির পরিবর্তনের ফলে তাও লুপ্ত হয়েছে। এইরকম লুপ্ত প্রাচীন কারক-বিভক্তির জায়গায় দেখা দিল অনুসর্গ এবং অনুসর্গ থেকে তৈরি হওয়া কয়েকটি নতুন কারক-বিভক্তি। পুরনো বিভক্তি কিছু থেকে গিয়েছে। যেমন প্রথমায় ই, উ, এ ; তৃতীয়ায় 'এঁ, এ এবং সপ্তমীতে ই এ। ব্যতিক্রমও আছে। তবে তা উল্লেখ করার মতো নয়। ফলত ষষ্ঠী-চতুর্থী-র, সপ্তমী-তৃতীয়া বা পঞ্চমীর অর্থে যে সমস্ত প্রত্যয়, প্রত্যয়স্থানীয় শব্দ অথবা অনুসর্গ ব্যবহার করা হয়েছিল, নতুন কারক-বিভক্তিগুলি অধিকাংশই তার থেকে তৈরি হয়েছে। কয়েকটি বিভক্তির মূল হচ্ছে স্থান বা অঙ্গাবাহক শব্দ। যেমন সপ্তমীতে 'অন্ত' থেকে বাংলা বা অসমীয়ায় এসেছে 'ত', পঞ্জাবীতে তার রূপ হ'ল 'আঁত'।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় কারক বলতে দু'টি। কর্তা বা মুখ্য কারক এবং তির্যক বা গৌণ কারক। পুরনো কর্তৃকারকের অর্থে ব্যবহৃত প্রথমা এবং তৃতীয় বিভক্তি একসঙ্গো মিশে গিয়ে হয়েছে মুখ্য কারক ; ষষ্ঠী ও সপ্তমীর মিশ্রণের ফলে হ'ল গৌণ কারক। অনুসর্গ, অনুসর্গ থেকে জাত বিভক্তিগুলির ব্যবহার গৌণ কারকেই।

সাত। **বচন ঃ** সিন্ধী, মারাঠী এবং পশ্চিমী হিন্দী ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মুখ্য কারকে একবচন বহুবচনের পার্থক্য দূর হওয়ায় বহুত্বজ্ঞাপক শব্দের সাহায্যে বা সম্বন্ধপদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বহুবচনের। যেমন বাংলায় সম্বন্ধপদ থেকে জাত 'লোকেরা'। কোথাও কোথাও অবশ্য তৃতীয়ার বহুবচনের পদ থেকে গেছে। যেমন ওড়িয়া, পূর্বীহিন্দী, পশ্চিমী হিন্দী।

আট। **ক্রিয়ার কাল ঃ** নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার কাল এবং ভাবের মধ্যে শুধু কর্তৃ ও কর্মভাববাচ্যে বর্তমান কালের এবং অনুজ্ঞার পুরোনো রূপ থেকে গেছে। কোনো কোনো সময় দেখা যায় ভবিষ্যৎ-কালের রূপের বদল ঘটেনি। সব ক্ষেত্রেই নিষ্ঠা এবং শতৃ প্রত্যয় যোগ করে অতীতকালের এবং কোনো কোনো সময় কৃত্য, তব্য বা শতৃ প্রত্যয় যুক্ত করে ভবিষ্যৎকাল তৈরি করা হয়েছে। যেমন 'চলা' ধাতুকে অবলম্বন করে চলিত বাংলায় হয়েছে 'চলি', 'ভবন্ত্' থেকে বাংলায় হয়েছে 'হইত', মৈথিলীতে 'হোত্'। নব্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যপর্ব থেকে প্রধানত 'অস্', 'ভূ' বা 'স্থা' ধাতুর পদ মূল ধাতুর অসমাপিকার সঙ্গো যুক্ত করে যৌগিক কালের প্রয়োগ দেখা দিল। এইভাবে 'গত'-র সঙ্গা 'অস্'-এর মিশ্রণে বাংলায় হ'ল 'গিয়াছে'। আবার হিন্দীতে এই 'গত'-র সঙ্গো 'ভূ' বা 'অস্' যোগ করে হ'ল 'গয়া হৈ'। এইরকম

‘জানন্ত’-র সঙ্গে ‘অস্’-ধাতুর সঙ্গে যুক্ত করে বাংলায় হ’ল ‘জানিতেছিল’ ; হিন্দীতে ‘জানন্ত’-র সঙ্গে ‘ভূ’ যোগ করে হয়েছে ‘জান্‌তা হৈ’।

২৫.১০ বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব

আর্যভাষা প্রতিষ্ঠার সময়ে দ্রাবিড় ভাষা ভারতে রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিকভাবেই এ ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব এসে পড়ে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের অনেকের ধারণা যে মূর্ধন্য ধ্বনি আর্যভাষায় দ্রাবিড় প্রভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। ড. সুকুমার সেন সহ কিছু ভাষাবিদ্ এ কথা সত্যি বলে মনে করেন না।

প্রভাব শুধু সংস্কৃতে নয়, অবশ্যই প্রাকৃতেও। উচ্চারণের ঝোঁক বা য-, বাক্যবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে তা ঠিক করা শক্ত। পঞ্চম শতাব্দীর আগে এ ভাষার দৃষ্টান্ত তেমন নেই। সেই পর্বের সঙ্গে সংস্কৃতের প্রচুর মিশ্রণ ঘটে গেছে। সে মিশ্রণ শব্দ সংগ্রহে, ব্যাকরণরীতিতে বিশেষ করে প্রাকৃতভাষায় সমাপিকা ক্রিয়াপদের পরিবর্তে নামপদের প্রয়োগে এই মিশ্রণ বা প্রভাব অনুভব করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কৃতে জায়গা পেয়েছে এ কোনো অতিরিক্ত অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে না। নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় সেগুলিকে আমরা তদ্ভব শব্দ হিসেবেই দেখেছি।

দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল অন্ধ্রপ্রদেশে, তেলেগু, তামিলনাড়ু ও উত্তর সিংহলে তামিল, কেরলে মালায়লম এবং কর্ণাটক বা সাবেক মহীশূরে কন্নড় বা কানাড়ী। এর মধ্যে সংস্কৃতের প্রভাব সবচেয়ে বেশি তেলেগু ভাষায়। তামিলে সে তুলনায় কম। দ্রাবিড় ভাষার সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন রয়েছে তামিল ভাষাতেই। সাহিত্যিক ঐশ্বর্য্য সবকটি ভাষাতেই রয়েছে।

অন্য দ্রাবিড় ভাষাগুলির কথাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলবার। এগুলি অবশ্য অনেক কমজোরী। বেলুচিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে কথিত **‘ব্রাহুই’** এমন একটি ভাষা। এর চারপাশে যে ভাষাগুলি আছে সেগুলি অবশ্য দ্রাবিড় নয়। রাজমহল অঞ্চলে যে ভাষা বলা হয়ে থাকে তার নাম ‘মালপাহাড়ী’। **‘কুডগু’** এবং **‘টুলু’**ও দ্রাবিড় ভাষা। এছাড়া রয়েছে মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যায় অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত **‘খোঁড়’, ‘গোঁড়’** বা **‘ওঁরাও’** ভাষা। সবই দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা। সুনীতিকুমারের মতে ব্রাহ্মীলিপির অক্ষরগুলিতে দক্ষিণভারতে বিশেষ রূপ নিয়েছিল। এর থেকেই মালয়ালম, তামিল, তেলুগু এবং কন্নড় বা কানাড়ী লিপির সৃষ্টি। দক্ষিণভারতে এরই বিস্তার।

বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় যে এখানে আর্য আসবার আগে দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর বাস ছিল। বাংলাদেশে আর্য অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই। ফলে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা সমন্বয়ের ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক ছিল।

প্রসঙ্গত বলতে হয় যে আর্য বৈয়াকরণেরা যে সমস্ত শব্দের সংস্কৃত মূল বা সূত্র ঠিক করতে পারেননি

সেগুলির শ্রেণি ঠিক করেছে **'দেশী'**। অনেক সময়েই সংস্কৃতের মোড়কে অনার্য-দ্রাবিড় শব্দকে সংস্কৃত আকার দেওয়া হয়েছে। ঘোটক, মালা, নীড়, মীন, খল, আলী, কটু, খট্টা—এইসব সংস্কৃত শব্দগুলি মূলগত বিচারে দ্রাবিড় শব্দ।

বাংলা দেশে বিভিন্ন স্থান নামে দ্রাবিড় প্রত্যয়ের পরিচয় খুবই স্পষ্ট। হিট্টা, হিট্টী, ভিট্টা, ভিট্টী বা বালুটে, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, হাওড়া, রিষড়া, চুঁচুড়া, বাঁকুড়া এর উদাহরণ। বাংলায় যে প্রত্যেক শব্দের প্রথমে শ্বাসাঘাত পড়ে তা আসলে দ্রাবিড় প্রভাবেরই ফল। এছাড়া ১. 'হওয়া' ক্রিয়ার উহ্য থাকা এবং ২. ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দের ব্যাপারেও এ প্রভাব ক্রিয়াশীল। লক্ষণীয় যে বৈদিক সংস্কৃতেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে তবে তা সংখ্যায় স্বল্প। বাংলায় যে তার প্রাচুর্য রয়েছে এর কারণ দ্রাবিড় প্রভাব। অনুকারাত্মক শব্দের ক্ষেত্রে তামিল প্রভাবের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। বাংলায় সাধারণত 'ট' দিয়েই অনুকারাত্মক শব্দের প্রয়োগ। তাচ্ছিল্য বোঝাতে 'ফ' চালু আছে।

ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমান যে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, স্বরসঙ্গতি এবং আদি স্বরলিপির ক্ষেত্রে দ্রাবিড় প্রভাব রয়েছে। বাংলায় আদিস্বরাগম হয় উচ্চারণের সুবিধে বা সৌকর্যের জন্য। ভাষাবিদেরা দেখিয়েছেন যে তামিল ভাশায় 'র' বা 'ল'-এর মতো শব্দের আগে আদি স্বরাগম খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলাতেও এই ব্যাপারটি আছে। তাই সংস্কৃত 'নগ্ন' হয়ে যায় 'লঙ্গা'। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে 'ন'-এর জায়গায় হয়েছে 'ল' এবং 'গ্ন' হয়েছে 'ঙ্গা'। বাংলায় আদিম স্বরাগম তার রূপ হ'ল 'উলঙ্গা'।

'চ'-বর্গের প্রাচীন উচ্চারণ ছিল সৃষ্ট। প্রাকৃতপর্বে তা হয়ে গিয়েছে ঘৃষ্ট। এটি স্পষ্টতই দ্রাবিড় প্রভাবের ফল।

বিশেষণের কমবেশি বা হেরফের নির্দেশ করতে গিয়ে বাংলায় ব্যবহৃত হয় 'সবচেয়ে ভাল' বা 'সবচেয়ে মন্দ' ধরনের বাকরীতি। এরকম প্রয়োগ বা ব্যবহারের পিছনে দ্রাবিড় প্রভাবের কথা অনেকেই অনুমান করেছেন।

একই কথা প্রযোজ্য কারক বা কারক-বিভক্তির মিশ্রণের ক্ষেত্রেও। যৌগিক ক্রিয়ারূপের সাহায্যে অর্থের বিবর্তনর ব্যাপারেও, অনেকে অনুমান করেন যে বাংলার ওপর দ্রাবিড় প্রভাব আছে। যেমন 'শুনে ফেলা', 'করে দেওয়া' বা 'গড়িয়ে পড়া' ইত্যাদি।

এছাড়া ভারতীয় ধ্বনিসমূহে 'মূর্ধন্য' ধ্বনির উপস্থিতি দ্রাবিড় প্রভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। ভাষাবিদেরা দেখিয়েছেন যে একমাত্র সুইডিশ ভাষা ছাড়া আর কোনো ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায় এর ব্যবহার নেই। ড. সুকুমার সেনের মতো ভাষাতাত্ত্বিকের অবশ্য অন্য মত। তাঁর কথা, এর পক্ষে তেমন যুক্তি কিছু নেই। তার কারণ আর্য ভাষাভাষীদের ভারতে আসবার আগেই এই ধ্বনিটির সৃষ্টি হয়েছিল। সুইডিশ ভাষাতে যে এই ধ্বনিটি এসেছিল তার কারণ ইন্দো-ইয়োরোপীয় দন্ত্য-ধ্বনির প্রভাব।

অনেকে মনে করেন বহুবচন বোঝাতে বাংলা 'গুলা' বা 'গুলি' বিভক্তির উৎস তামিল বহুচন 'গল' বিভক্তি। এ সম্পর্কে বলতে হয় যে বাংলায় এটি বিভক্তি নয়, শব্দ এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর আগে বহুত্ববোধক অর্থে এর প্রয়োগও নেই। এর অনেক আগেই দ্রাবিড়ের সঙ্গো বাংলা ভাষার সরাসরি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং এই সময়ে দ্রাবিড় প্রভাব সম্ভব নয়।

২৫.১১ বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব

ভারতে আসবার পর আর্য ভাষাভাষীদের সঙ্গো পরিচয় হয়েছিল দ্রাবিড় এবং কোল বা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গো। কোল ভাষায় 'কোল' শব্দের অর্থ 'মানুষ'। সংস্কৃতে তার অর্থ হ'ল 'শূকর'। এই অর্থান্তরের মধ্যেই এক অবজ্ঞা বা ঘৃণার ভাব প্রকাশ পায়। ম্যাক্সমুলর সাহে সেই ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করেই মুণ্ডাজাতি, মুণ্ডাভাষা বলে এর শ্রেণিবিভাজন করেছেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষজন ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে থাকলেও এরা প্রধানত—অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। **সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, কুরকু, শবর** এবং **গদ** এই মুণ্ডা বা কোল গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা। সাহিত্যসম্পদ নেই বললেই চলে। আন্দামানী ভাষার বর্গীকরণ ঠিক হয়নি। নিকোবরী ভাষা 'মনখেমর' গোত্রের।

যাই হোক আর্য-অনার্য সমন্বয়-মিশ্রণের ফলে হ'ল বৈদিক আর্য-সংস্কৃতি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ এবং জৈন সংস্কৃতির আকার নিয়েছে। দেবদেবী কল্পনা বা ভাষা সবক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। এই মিশ্রণের ফলে দেখা গেল যে আর্যভাষার ধাতু ও শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও ভাষার কাঠামো অন্যরকম হয়ে গেল। সুনীতিকুমার লিখেছেন, 'অনার্য-ভাষার মরা গাঙ্গের খাত দিয়া আর্য-ভাষার ধাতু ও শব্দরূপ বহিয়া চলিল।' এর ফলে—অনার্য শব্দেরও প্রবেশ ঘটল। এইসব শব্দের মধ্যে একান্তভাবে এই দেশের বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় এমন শব্দ, নানান গাছপালা, জীবজন্তুর নাম, অনার্যদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি বোঝায় বা প্রাকৃতিক পদার্থের নামও কিছু কিছু নেওয়া হয়েছিল। মোট কথা যাকে হিন্দু সভ্যতা বলি তার নির্মাণে এই অনার্য উপাদান-উপকরণের অবদান অশেষ।

একটি দৃষ্টান্ত। সকলেরই জানা গেছে যে ভারতীয় সভ্যতায় 'পান' বা তাম্বুলের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সংস্কৃতি কিন্তু প্রাচীন আর্যদের কাছে পরিচিত ছিল না। এ জিনিস ভারত, ইন্দোচীন, মালয় বা ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশের মানুষদের নিজস্ব জিনিস। কিন্তু আর্য ভাষাভাষীরা একে গ্রহণ করল। অথচ, এটি বোঝানোর মতো কোনো শব্দ তাদের ভাষায় না থাকতে অনার্য ভাষা থেকে তা গ্রহণ করতে হ'ল এবং এইভাবেই 'কোল' গোত্রের 'তাম্বল' শব্দের জায়গা পেয়ে যাওয়া। অবশ্য এত সত্ত্বেও এর 'অ-সংস্কৃত' গন্ধ যায়নি এবং ভারতের বাইরে কোনো আর্যভাষায় এ শব্দ নেই। এটি একান্তভাবেই যেন ভারতবর্ষের এবং এও দেখবার যে ভারতবর্ষের বাইরে ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় কোল ভাষার সঙ্গো সম্পর্ক আছে এমন মোন্‌খেমর প্রভৃতি ভাষায় ধাতু ও প্রত্যয়

যুক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে 'তম্' উপসর্গের সঙ্গো 'বল' যুক্ত করে 'তম্বল্' এইরকম কোনো শব্দের অস্তিত্ব ছিল। উপসর্গ বাদ দিয়ে শুধু 'বল' শব্দ পাতাজাতীয় বস্তু বোঝাতে ভারতে কখনও কখনও ব্যবহৃত হত। ভারতের বাইরে কোথাও কোথাও এই জাতীয় ভাষায় এখনও এর ব্যবহার আছে। যেমন 'পান' বোঝাতে 'বল্' শব্দের প্রয়োগ খাসিয়া ভাষায় এখনও আছে। এই শব্দের অনুসরণেই 'বাবু' শব্দের ব্যবহার। 'বারুই' ও 'বরোজ' শব্দ দুটি এই প্রসঙ্গো উল্লেখ্য। শব্দদুটি অংশত বাংলার দেশি শব্দ এবং এদেশে প্রচলিত অনার্যভাষা থেকেই এসেছে। 'তাঁবোল' ও 'তাম্লী' শব্দদুটির ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন এখানে শব্দের প্রথমে, শেষে এমনকি মধ্যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। এছাড়া রয়েছে অঘোষ, অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনির অস্তিত্ব। আছে অর্ধস্বর, স্বর, ব্যঞ্জন এবং অর্ধব্যঞ্জনও। আছে তিনরকম বচন, দু'রকম লিঙ্গ। শব্দদ্বিত্ব। অক্ষর বেশিরভাগই দু'অক্ষরের।

বাংলায় ধ্বন্যাত্মক এবং ভাবাত্মক শব্দগুলির পিছনে রয়েছে কোল বা মুণ্ডা ভাষার প্রভাব। খড়, খুঁটি, খড়ম, খিড়কি, খোকা, চিংড়ি, ঝিঙ্গা, ঝাউ, ঝোল, ডিম্ব, ডিঙ্গা, ঢাক, ঢিবি, ঢোল, ঢেঁকি, ঢিল, মুড়ি, মুড়কি-র মতো শব্দগুলির উৎস এই মুণ্ডা ভাষা। কম্বল, কদলী, বাণ, লাঙ্গাল, লিঙ্গা, লগুড় প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলি কোলগোত্রীয় কোনো ভাষাগোষ্ঠীরই অবদান। গুণবার জন্য আমরা যে বুড়ি, বুড়ি শব্দ ব্যবহার করি সেও এই ভাষারই উত্তরাধিকার। এমনকি এ কথাও অনেকে মনে করেন যে গঙ্গা, গোদাবরী প্রভৃতি নদী এবং 'বঙ্গা'—এই নামেও এই অস্ট্রিক বা কোল ভাষার প্রভাব আছে। বাংলা ক্রিয়াপদে লিঙ্গ নেই। সেটিও এই প্রভাবের ফল।

২৫.১১.১ ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠী

এই গোষ্ঠীর তিনটি প্রধান শাখা। তারই একটি হ'ল তিব্বতী-বর্মী বা ভোট বর্মী। এর অনেক উপশাখা ভারতবর্ষে প্রচলিত। এর মধ্যে রয়েছে তিব্বতী, লেপ্চা, কিরান্তি এবং গুরুং শাখা। একত্রে এর পরিচিতি হ'ল ভোটপাহাড়ী। তিব্বতে তিব্বতী ভাষা ভোট। সিকিমে লেপ্চা ভাষা। বৌদ্ধ পুরোহিত অর্থে 'লামা', তিব্বতী কম্বল অর্থে 'ভোট' এবং অপরিশোধিত চিনি বোঝাতে 'ভুরা' শব্দের প্রয়োগ বাংলায় আছে।

অহোম্প্ কাছাড়ী, বোড়ো, গারো, নাগা, লুসাই, টিন্‌রা, মণিপুরী, কুকিচীনা—সব মিলিয়ে একসঙ্গো আসামী শ্রেণি। 'আসাম' বা 'অসম' শব্দটি এসেছে 'অহোম্' থেকে।

ভারতীয় আর্যভাষায় এই ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব তেমন বিরাট কিছু নয়। ভাষাবিদদের বক্তব্য তাই। তবে কীচক, তসর, সিন্দুর, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শব্দের মূলে এই চীনীয় ভাষার প্রভাব থাকতে পারে। এর থেকে আধুনিক বাংলাতেও কিছু শব্দ এসে গেছে বা নেওয়া হয়েছে। যেমন বর্মী ভাষা থেকে এসেছে 'লুঙ্গি', 'ফুঙ্গি' ; চীনাভাষা থেকে 'চা' বা 'লিচু'-র মতো শব্দ। 'চিনি' কিন্তু চীনা শব্দ নয়। চীনে শর্করার পরিশোধনের কাজ হয়েছিল বলে এর নাম হয়েছিল 'চিনি'।

চিত্র ঃ ক

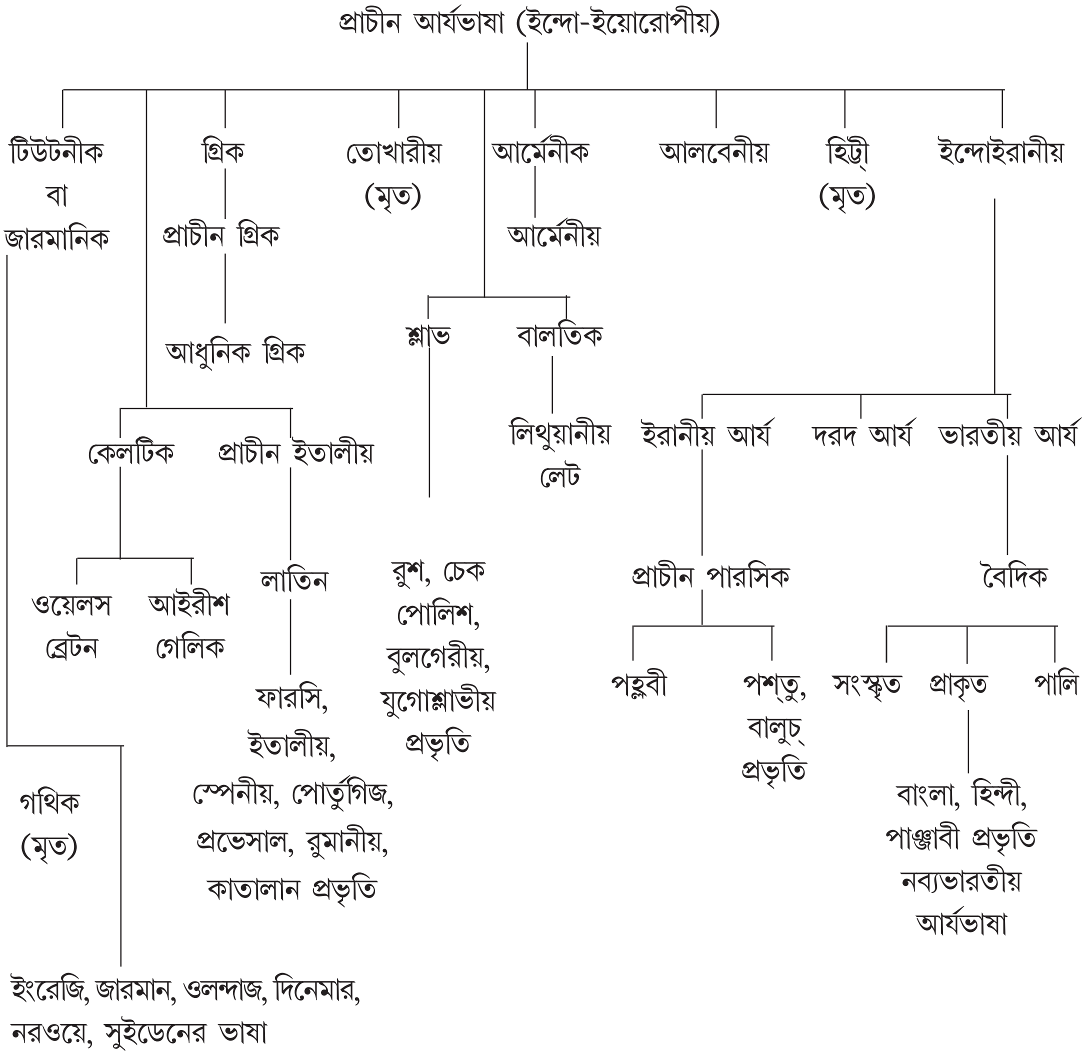

প্রাচীন আর্যভাষা (ইন্দো-ইয়োরোপীয়)
টিউটনীক বা জারমানিক
গ্রিক
তোখারীয় (মৃত)
আর্মেনীক
আলবেনীয়
হিট্টি (মৃত)
ইন্দোইরানীয়
প্রাচীন গ্রিক
আর্মেনীয়
আধুনিক গ্রিক
শ্লাভ
বালতিক
কেলটিক
প্রাচীন ইতালীয়
লিথুয়ানীয় লেট
ইরানীয় আর্য
দরদ আর্য
ভারতীয় আর্য
লাতিন
রুশ, চেক পোলিশ, বুলগেরীয়, যুগোশ্লাভীয় প্রভৃতি
প্রাচীন পারসিক
বৈদিক
ওয়েলস ব্রেটন
আইরীশ গেলিক
ফারসি, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগিজ, প্রভেসাল, রুমানীয়, কাতালান প্রভৃতি
পহ্লবী
পশ্‌তু, বালুচ্ প্রভৃতি
সংস্কৃত
প্রাকৃত
পালি
বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষা
গথিক (মৃত)
ইংরেজি, জারমান, ওলন্দাজ, দিনেমার, নরওয়ে, সুইডেনের ভাষা

বাংলার সঙ্গে উদ্ভব সূত্রে সম্পর্কান্বিত ভাষাগোষ্ঠী
সুনীতিকুমার বলেছিলেন বাংলার 'জ্ঞাতি স্থানীয়' ভাষা।

চিত্র ঃ খ

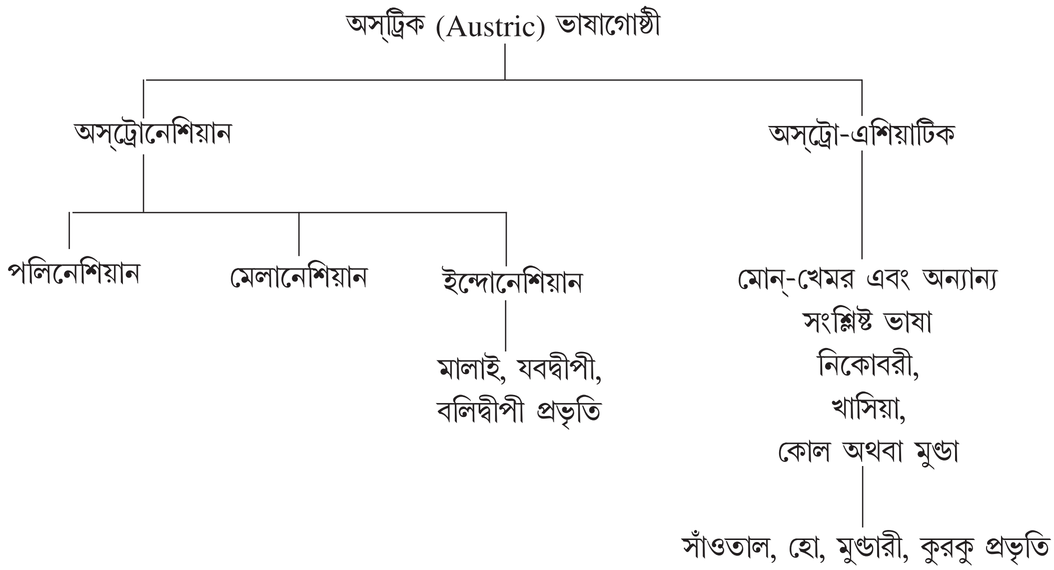

চিত্র ঃ গ

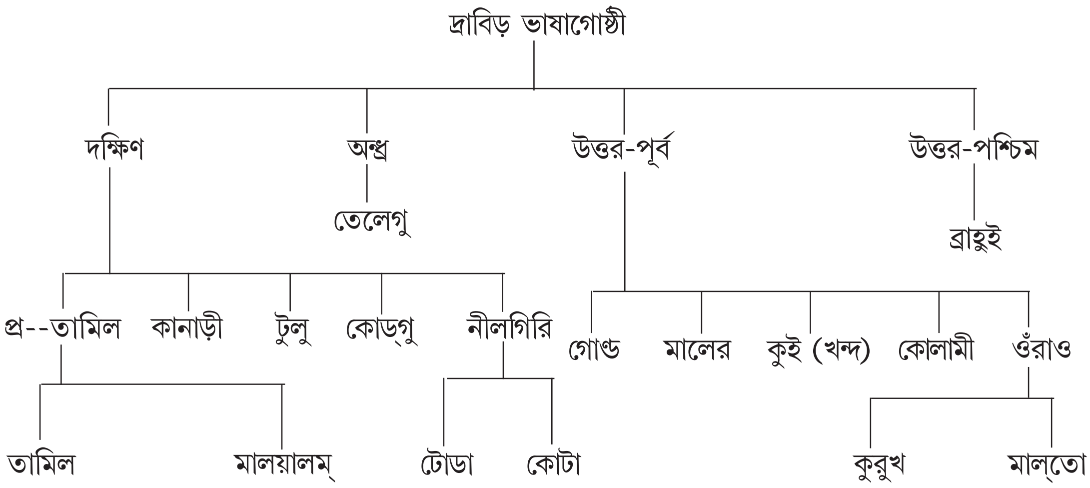

চিত্র ঃ ঘ **নব্যভারতীয় আর্য ভাষা**

- পশ্চিমা, উত্তর-পশ্চিমা
  - প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী
    - গুজরাটি
    - রাজস্থানী ভাষাগুচ্ছ
      - জয়পুর
      - মারোয়াড়ী
      - মেবারী
      - খান্দেসী
      - মালবী
  - সিন্ধী
  - লহন্দী (পশ্চিমা পাঞ্জাবী)
  - পূর্বী

(২)

- দক্ষিণ-পশ্চিমা (মহারাষ্ট্রী) প্রাচীন মারাঠী
  - মারাঠী
  - কোঙ্কনী

(৩)

- উত্তরা
  - পাহাড়ী
    - পূর্বী নেপালী
    - মধ্য
      - কুমায়ুনী
      - গাড়োয়ালী
      - চম্বল জৌনসারী
    - পশ্চিমী

(৪)

- কুরুপাঞ্চাল এবং পশ্চিম দোয়াব অঞ্চলের কথ্যভাষা
  - মধ্যপ্রদেশী প্রাকৃত
    - শৌরসেনী
      - বাঙ্গারু বা হরিয়ানী
      - কথ্য হিন্দুস্থানী
      - ব্রজভাষা
      - কনৌজী
      - বুন্দেলী

নব্যভারতীয় আর্য ভাষা

(৫)

- মধ্যপ্রাচ্যা বা মধ্যদেশীয় প্রাকৃত
  - পূর্বী হিন্দী বা কোশলী ভাষাগুচ্ছ
    - অবধী
    - ছত্তিশগড়ী
    - বাঘেলী

(৬)

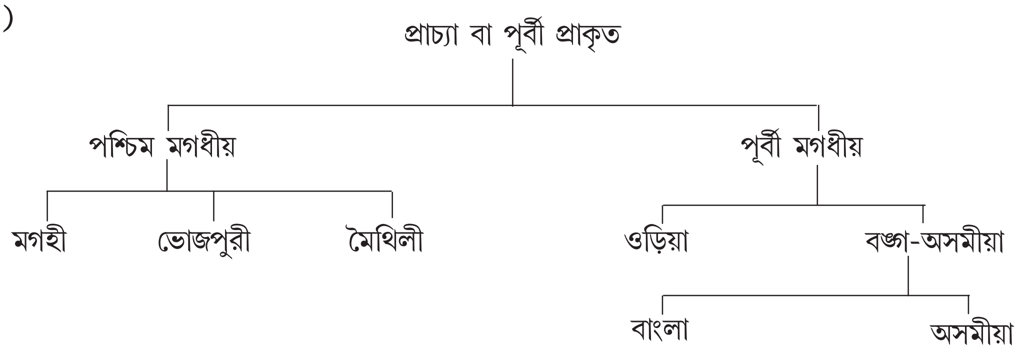

(৭)

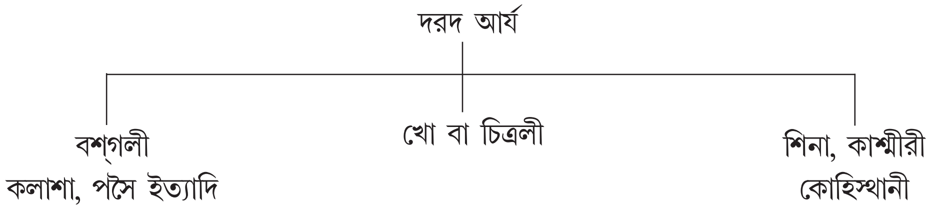

২৫.১২ সারাংশ

আনুমানিক পনেরশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় ভারতবর্ষ আর্যভাষীদের আগমন কাল। ঋক্‌বেদের ভাষা হ'ল প্রাচীনতম। ইন্দো-ইয়োরোপীয় অন্য-কয়েকটি ভাষার প্রসঙ্গাও এসেছে। কীভাবে বৈদিক ভাষা পাণিনির হাতে সংস্কৃত হয়েছে সে বিবরণও এখানে রয়েছে। আছে বৈদিক ও সংস্কৃতের তুলনামূলক আলোচনা। প্রাচীন, মধ্য ও নব্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ, নব্যভারতীয় আর্যভাষার বিবরণ এবং প্রসঙ্গাত বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত সহ আলোচিত হয়েছে। এক কথায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে একেবারে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সময়ের ভাষার বিবর্তন বর্তমান অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

২৫.১৩ অনুশীলনী

১. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) হিট্টীকে বাদ দিলে কোন ভাষা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীনতম নিদর্শন ?

(খ) 'অষ্টাধ্যায়ী'-এর সূত্রসংখ্যা কত ?

(গ) পাণিনি শব্দের কতরকম বিভাজনের কথা বলেছেন ?

(ঘ) 'প্রাকৃত' কথাটির তাৎপর্য কী ?

(ঙ) ‘বিকরণ’ কাকে বলে ?

(চ) ‘ব্রজভাষা’ এবং ‘খড়বোলী’ কোন্ ভাষার স্মারক ?

(ছ) দ্রাবিড় ভাষাগুলির নাম বলুন।

(জ) ‘গুলা’ বা ‘গুলি’ বিভক্তিগুলির উৎস কি কোনো দ্রাবিড় ভাষা ?

(ঝ) অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির নাম বলুন।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ**

(ক) বৈদিক ও সংস্কৃতের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণগুলির পরিচয় দিন।

(গ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে মগধী, ওড়িয়া এবং অসমিয়ার সাধারণ পরিচয় দিন।

(ঘ) বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক প্রভাবের প্রধান দিকগুলির উল্লেখ করুন।

২৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ODBI (অংশবিশেষ)।

২. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

৩. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

৪. শুদ্ধসত্ত্ব বসু—বাংলা ভাষার ভূমিকা।

৫. অতীন্দ্র মজুমদার—ভাষাতত্ত্ব।

৬. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।